Contents

বিবাহ-পাঠ
শাইখ মাহমুদ আল-মিসরী ও ডা. শামসুল আরেফীন
মাকতাবাতুল আসলাফ
সূচিপত্র
শুরু

বিয়ের সঠিক সময়

পাত্রী নির্বাচন
বিয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ
এক. দ্বীনদারি
দুই. সচ্চরিত্র
তিন. সৌন্দর্য
চার. অভিজাত বংশের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বাছাই করা
পাঁচ. স্বল্প দেনমোহরে বিয়ে সম্পন্ন করা
ছয়. ভিন্ন গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করা
সাত. কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা

বিবাহ-পাঠ

শাইখ মাহমুদ আল-মিসরী ও ডা. শামসুল আরেফীন

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচিপত্র

- শুরু
- বিয়ের সঠিক সময়
- পাত্রী নির্বাচন
- মা : মহাপুরুষ তৈরির নির্মাণশিল্পী
- পূর্বসূরি পুণ্যবতী নারীদের দৃষ্টান্ত
- পাত্র নির্বাচন
- পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখা
- নিকাহ
- বাসর রাত
- ব্যাচেলরের শেষ-রাত
- পরিশিষ্ট : তালাক

শুরু

ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আগাম-সমস্যা এড়ানোর এবং উদ্ভূত-সমস্যা নিরসনের নির্দেশনা রয়েছে। জীবনের যতগুলো সেক্টরের মুখোমুখি মানুষকে হতে হয়, সবগুলো—ব্যক্তিগত-শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-আইনী-রাষ্ট্রীয়—এমন প্রতিটি পদক্ষেপেই ইসলাম সমস্যা এড়িয়ে সমাধানের পথ দেখায়। কেননা ইসলাম কোনো সৃষ্টির বানানো নয়। ইসলাম এমন একজনের দেয়া, যিনি আমাদের বায়োলজির স্রষ্টা, আমাদের সাইকোলজির স্রষ্টা, আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের স্রষ্টা, স্থান-কালের স্রষ্টা, প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা (law of nature), সকল দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনিই এমন একটা যাপন-সিস্টেম মানুষকে দিয়েছেন, যা মানুষ-প্রাণিজগত-উদ্ভিদজগত-পরিবেশ-সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য বজায় রেখে নিশ্চিন্ত-প্রশান্ত জীবনের খোঁজ দেবে, আর মৃত্যুর পরের জীবনে মহাসফলতা নিশ্চিত করবে। বিপরীতে মানুষের রচিত ও গবেষণালব্ধ জীবন-দর্শন আমাদের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, মনঃস্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ, পরিবেশ-বিধ্বংসী, জগতের ভারসাম্য নষ্টকারী, অসুস্থ ভবিষ্যতের হাতছানি।

বিবাহ ইসলামের এমন এক বিধান, যা দেহ-মন-আত্মা-প্রজন্ম-সমাজ-পরিবারের সুস্থতা নিশ্চিত করে। বিপরীতে বিবাহের অনুপস্থিতি বা বিবাহ-প্রক্রিয়ার জটিলায়ন জন্ম দেয় শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, পরিবার

> [ক] https://twitter.com/spectatorindex / status/988307897955237888?lang=en
> [খ] এই পয়েন্টগুলো দেয়া এজন্য যে, সামনে যখন এই [ক] আবার পাবেন, তখন পিছনের এই আলোচনাটার সাথে মিলিয়ে নেবেন।

বিভিন্ন দেশে বিবাহ-বহির্ভূত জন্মহার

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ	দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	৫৯.৭%	Ireland	৩৬.৬%
Bulgaria	৫৮.৬%	Germany	৩৫.৫%
Sweden	৫৪.৯%	Romania	৩১.৩%
Portugal	৫২.৮%	Italy	২৮%
Netherlands	৫০.৪%	Poland	২৫%
Belgium	৫১%	Croatia	১৮.৯%
UK	৪৮.৫%	Greece	৯.৪%
Hungary	৪৬.৯%		
Spain	৪৫.৯%		
USA	৪১%		

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জন্ম নেয়া ৫ হাজার শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)। আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে-ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলো—

ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের— - আইকিউ কম (lower cognitive test scores) - আক্রমণাত্মক আচরণ - স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট) - সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরাও বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে।

এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেয়া হয়, 'অবিবাহিত দম্পতি' হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) সমাজে উৎসাহ দেয়, এমন বিষয়গুলোকে আবার ভেবে দেখতে হবে বিজ্ঞানীদের। (The study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

কী বুঝা গেল? বিবাহ ছাড়া সন্তান যে দেশে অর্ধেক, তাদের ভবিষ্যত অস্থির না সুস্থির? এভাবেই ইসলামের প্রতিটি বিধান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে প্রশান্তিময় ইহজীবন ও পরজীবন দেবার জন্য। আজ পশ্চিমা বস্তুবাদী গবেষণা কীসের দিকে ইঙ্গিত করছে? যাকে তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, সেই ধর্মীয় বিধানের দিকেই তো, নাকি? এই একটা বিধানকে বাধ্যতামূলক করে ইসলাম ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয়-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মহাসমস্যাকে পাশ কাটানোর রাস্তা দেখিয়েছে। এভাবেই প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সমাজের একই চিত্রায়ন দেখানো সম্ভব।

[১] Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America, National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, National Marriage Project at the University of Virginia Ezra Klein (March 25, 2013). Nine facts about marriage and childbirth in the United States. Washington post. [২] Lavar Young (Aug 16. 2011). Fragile Families: Most Children Born Out of Wedlock Aren't OK. HuffPost.

বিয়ের সঠিক সময়

বিগত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিয়ে ব্যাপারটা মাঝবয়েসে এসে ঠেকেনি। ১৯৬০ সালেও মেয়েদের প্রথম বিয়ের গড় বয়স ছিল ২০.৩ আর পুরুষের ২২.৮ বছর। কিন্তু ২০১০ সালে এসে এই গড় দাঁড়ায় মেয়েদের ২৫.৮ আর ছেলেদের

২৮.৩ বছরে। [১] মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিমা বিশ্বে এবং গত শতকের শেষ-চতুর্থাংশে এশিয়ায় বিয়ে পেছানোর হিড়িক ওঠে। বিষয়গুলো একটু বোঝার আছে। এর কারণ হলো—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আগ্রাসী বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উত্থান
- সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রভাব বিস্তার
- বিশ্বব্যবস্থার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ

বর্তমানে পুঁজিবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এই দুই বিশ্বব্যবস্থা, যাকে আমরা স্নায়ুযুদ্ধ নামে চিনি। মহাকাশ বিজয়াভিযান থেকে নিয়ে জলে-স্থলে আধিপত্য বিস্তার, কোনোখানেই বাকি নেই। পরস্পরকে অর্থনৈতিকভাবে টেক্কা দেয়ার প্রচেষ্টাও থেমে নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই বোঝা গিয়েছিল নারীদেরকে কারখানায় আনার লাভটা। পুরুষদের যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলোতে নারীকর্মী ছিল প্রচুর, কেননা পুরুষ নিহত-নিখোঁজ ছিল বহু। সেসময়কার তিনটি পোস্টার দেখলেই বুঝবেন, নারীদেরকে কারখানামুখী করবার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা। একটি বিখ্যাত পোস্টার "We Can Do It!", ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন J. Howard Miller নারীকর্মীদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য। আরেকটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম Rosie the Riveter, আমেরিকা-বৃটেনে অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে এসবে অংশ নেয়।

মজা পেয়ে গেল মালিকেরা, নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের পক্ষে ব্যাপক লাভজনক সাব্যস্ত হলো।

এক. বেতন কম দিতে হতো। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালে করতে হয়েছিল 'সমান বেতন আইন'। [খ]

দুই. চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে। [গ] ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994) পুঁজিপতিরা তো এটাই চায়। বেতন কম দিলে পুঁজিপতির পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে তিনটি কাজ—

- পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে স্বাবলম্বী হবার নামে। নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। [ঘ]
- চাকরি, ক্যারিয়ার—এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে। 'আগে আগে বিয়ে'-কে ভিলেন বানাতে হবে। [ঙ]
- বিয়ে, গর্ভধারণ, বাচ্চা পালন-কে ছোট ও ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে। [চ]

সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে আবার ফিরিয়ে আনা হলো 'নারীবাদী আন্দোলন'-কে। আগের ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলা নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভের আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল আমেরিকার নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে সেই ১৯২০ সালে। ৬০-এর দশকে আবার চাঙা করে তোলা হলো ৪০ বছর আগের সেই হাইপ। সমাজতন্ত্রও একই কৌশল নিতে দেরি করল না। আসলে সমাজতন্ত্রও একধরনের 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' বৈ কিছু না। পার্থক্য কেবল ওখানে পুঁজি হলো পুঁজিপতিদের হাতে; আর এখানে পুঁজি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর 'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেলল।

১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল : সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও, ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল আন্দোলন। এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না, সামাজিক সমতা। দাবিগুলো ছিল যৌনতা ও সম্পর্ক, গর্ভপাতের অধিকার, ঘরোয়া কাজ—এসব কেন্দ্রিক। অর্জনগুলো দেখলেই বুঝবেন কী নিয়ে আন্দোলন চলছিল—

- সমান বেতন আইন, ১৯৬৩ : মানে এর আগে সমান বেতন দেয়া হচ্ছিল না, আগেই বললাম। [খ]
- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন। [চ]
- শিক্ষার সমানাধিকার : (টাইটেল ৯) আর্লি বিয়েশাদীর কফিনে শেষ পেরেক। [ঙ]
- ১৯৭৩ সালে Roe vs Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন। [চ]

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮০-এর দশকের শেষ অব্দি ছিল সেকেন্ড ওয়েভের সময়কাল। সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলন কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয়, এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করে। নিজেদেরকে শারীরিকভাবেও পুরুষের সমকক্ষ দাবি করার ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রত্যাখ্যানের একটা ম্যাসেজ উঠে আসে। ১৯৬৮ সালে 'মিস আমেরিকা' যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয়, এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। পুরুষের চোখে যা যা নারীর প্রতীক সেগুলো পরিত্যাগ করার একটা নমুনা।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। একক সফল বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে 'আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদ' বিজয়ী হয়। নারীবাদ হয়ে গেল পুঁজিবাদের লাভজনক প্রোজেক্ট। নারীবাদের পালে সব ধরনের ফুঁ এখন পুঁজিবাদই দেয়। Cambridge University-র gender studies-এর প্রফেসর Nancy Fraser লেখেন— 'পুরুষ জীবিকা উপার্জন করবে, নারী ঘর সামলাবে—এই পরিবার-কাঠামো (male bread-winner female homemaker family) ছিল রাষ্ট্রায়ত্ব পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। নারীবাদের নামে আমরা এই কাঠামোটার সমালোচনা করেছিলাম। এই সমালোচনা এখন কাজে লাগাচ্ছে কর্পোরেট বেসরকারি পুঁজিবাদ (flexible capitalism)। কেননা বেসরকারি পুঁজিবাদ নির্ভরই করে নারীর শ্রমের উপর, বিশেষ করে সেবা ও শিল্প খাতে নারীর কমমূল্যের শ্রমের উপর। এই শ্রম কেবল তরুণী অবিবাহিতারা দেয় তা না, বরং বিবাহিতা ও মায়েরাও দিচ্ছে। কেবল কট্টর নারীবাদীরাই দেয় তা না, বরং সব জাতির মেয়েরাই দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়াতেই যেহেতু মেয়েরা শ্রমবাজারে বানের মতো আসছে, আগের সেই পরিবার-কাঠামো বদলে হয়েছে 'দুই রোজগেরে পরিবার (two-earner fam-ily), নারীবাদের কারণে।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হলো— - বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করা - ভোক্তা সৃষ্টি করা - শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা

এই তিনটি লক্ষ্য অর্জনে তারা দুনিয়াজুড়ে কী করেছে দেখুন—

- **বাজারে নতুন ভোক্তা সৃষ্টি করা:** নারীকেও ক্রেতা বানাও, ভোক্তা বানাও। আগে পরিবার ইউনিট হিসেবে ক্রেতা ছিল, এখন স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন দুই ক্রেতা।
- **শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা:** চাকরির জন্য প্রার্থী বাড়াও। নারীদের শ্রমবাজারে নিয়ে এসো। পুরুষের সাথে নারীর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করো।
- **নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করা:** চাহিদা যারা পূরণ করছে (পরিবার ও সমাজ), তাদেরকে সরিয়ে দেয়া বা পৃথক করে দেয়া বা একত্র হতে না দেয়া। সেই চাহিদা নিয়ে পণ্য ছাড়ো, নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করো।

এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো: - নারীশিক্ষা - নারীকে নির্ভরশীল না রেখে স্বাবলম্বী করা - নারী ক্ষমতায়ন - নারীপ্রগতি - ছেলেদের স্বাবলম্বী হওয়া পেছাও - পরিবার গঠন পেছাও - দীর্ঘসূত্রী কারিকুলাম - চাকরির কৃত্রিম প্রতিযোগিতা

এর ফলে পশ্চিমের গণমানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। ফলে এখন যা হলো—

১. পুঁজিবাদ মানুষকে ভোগবাদী বানিয়ে নিয়েছে, নাহলে তার পণ্য ভোগ করবে কে? ফলে পুঁজিপতিদের তৈরি নিত্যনতুন পণ্যের দরকার পড়ছে জীবন উপভোগের জন্য। এইসব নতুন নতুন চাহিদা নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। [ঘ]

২. ভোগবাদী মানুষ ভোগের সামর্থ্য অর্জনকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ক্যারিয়ার নারী-পুরুষ সকলের মা'বুদ। টেস্টোস্টেরোন-বিধৌত যৌবন ভোগে কাটিয়ে 'বিয়ে' এখন মধ্যবয়সের (৩৫-৪০) চিন্তা। [ঘ]

৩. নারী-পুরুষ উভয়েই এখন পুঁজিবাদের বাজার, উভয়েই ক্রেতা। ফলে বিয়েটা এখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নয়, দৈহিক প্রয়োজন নয়, বিয়ে এখন জাস্ট পার্টনারশিপ আর শেষ-বয়সের সঙ্গী খোঁজা। ফলে বিয়ে যত দেরিতে করা

যায়, যত ভোগ করে ও ভোগের সামর্থ্য অর্জনের পর করা যায় তত ভালো। [ঘ]

৪. আমেরিকায় ডিভোর্স বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। গড়ে একটা ডিভোর্সে খরচা হয় ১৫ হাজার ডলার। যা বাড়তে পারে রাজ্যভেদে; উকিল খরচ, সন্তান আছে কি না, যৌথ প্রোপার্টি আছে কি না, কতদিন লাগছে নিষ্পত্তি হতে—এসব মিলিয়ে। বিয়ের চাহিদা যদি ভিন্নভাবে মেটে, কী দরকার এসব হ্যাপা-র?

৫. লিভ-টুগেদার তাদের সমাজে একটা অনুমোদিত কালচার। সারাজীবন বিয়ে না করলেই কী যায় আসে। বিকল্প তো আছেই। বিয়ে মানে তো বাধ্যবাধকতা, আর লিভ-টুগেদারে ওসব ঝামেলা নেই। [ক] ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৫ লাখ, ২০০২-এ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ। [২]

৬. নারীবাদের সুবাদে বিয়ে, সন্তানধারণ—এসব পশ্চিমের মেয়েদের কাছে ঝামেলা। ক্যারিয়ারের শত্রু এগুলো। [চ]

৭. সন্তান নিলেও বিয়ে না করেই তো নেয়া যায়। পশ্চিমা বিশ্বে জন্মানো অর্ধেক শিশু 'বিয়ে-ছাড়া'। [ক]

এবার একটা রিসার্চ দেখাই। যদিও বেশ পুরনো, ২০১৩ সালের। University of Virginia-এর আন্ডারে National Marriage Project-এর একটা ক্যাম্পেইন হয়—'National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy'. তারা একটা রিপোর্ট করে 'Knot Yet : The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America' নামে। রিপোর্টের সারাংশ হলো—

- ২৫ বছর বয়সে, ৪৪% নারীর প্রথম সন্তান হয়। কিন্তু ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করে ৩৮% নারী।[ক]
- প্রথম শিশুদের ৪৮% হলো কুমারী মায়ের সন্তান। [ক]
- কুমারী মায়েদের ২৩% টিনেজার। ৬০%-এর বয়স ২০-এর ঘরে।
- যেসব নারী ৩০ বছর বয়স অব্দি বিয়ে না করে থাকে তারা বছরে $১৮,১৫২ (ভার্সিটি-পাশ) ও $৪,০৫২ (কলেজ-পাশ) বেশি আয় করে, ২০-এর আগে যারা বিয়ে করেছে তাদের চেয়ে। [ঘ]
- ৩০ বছরের ভেতর যে-সব ছেলের বয়স, তাদের মধ্যে যারা ২০-এর ঘরে বিয়ে করেছিল, নিজ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুপাতে তাদের ব্যক্তিগত ইনকাম সর্বোচ্চ। মধ্য ৩০-এও যারা বিয়ে করেনি তাদের ইনকাম সর্বনিম্ন, এমনকি যারা ২০-এর আগে বিয়ে করেছে, তাদের চেয়েও কম।
- চমকপ্রদ একটা ফল এসেছে—আগের যুগে যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা বিয়ে করত, ঠিক একই বয়সে এখন তারা প্রথমে লিভ-টুগেদারে (first coresidential relationship) প্রবেশ করছে। পার্থক্য এটাই যে, আগে বিয়ে করত, এখন বিয়ে করে না। আগে দায়িত্ব নিত, এখন নেয় না। [ক]
- সন্তান আছে এবং ২০-এর ঘরে বয়স, এমন লিভ-টুগেদার দম্পতির ৪০% সন্তানের বয়স ৫ হবার আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যা বিবাহিত দম্পতির চেয়ে ৩ গুণ বেশি। [ক]
- শুধু ভার্সিটি-পাশ নারীই দেরিতে বিয়ে করছে তাই না, ওয়েটারের চাকরি করে এমন নারীরাও ৩০-এর আশেপাশে বিয়ে করে। [ঘ]
- পশ্চিমের কালচারটাই এখন এমন, বিয়েকে তারা দেখে গাঁথনির শেষ ইট (capstone) হিসেবে, ভিতের ইট (cornerstone) হিসেবে না। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের শুরু হিসেবে না, বরং সব কাজ সেরে শেষ কাজ হিসেবে বিয়েকে রাখে।
- ৯১% তরুণ-তরুণী ভাবে, সম্পূর্ণ আর্থিকভাবে স্বাধীন না হয়ে বিয়ে করা যাবে না।
- ৯০% মনে করে শিক্ষাজীবন শেষ না করে বিয়ে করা যাবে না।
- ৫১% মনে করে 'ক্যারিয়ার অবশ্যই আগে'। তারা ভাবে ১/২ বছর ফুলটাইম চাকরি করে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। [ঘ]

Urban Institute-এর একজন রিসার্চার Robert Lerman ও তাঁর সহকর্মী Avner Ahituv পেয়েছেন যে, বিয়ে একজন পুরুষের আয়কে ২০% বাড়ায়। ২০-২৮ বছর বয়সী বিবাহিত লোকেরা জীবন নিয়ে "highly satisfied" হবার সম্ভাবনা বেশি। Authentic Happiness বইয়ে পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর Martin E. P. Seligman, Ph.D বলেন : 'বহু রিসার্চ দেখিয়েছে যে, একটা ভালো চাকরি পাবার চেয়ে বিয়ে করাটা বেশি সুখ নিশ্চিত করে।"

University of Virginia-এর সমাজবিদ Brad Wilcox এই রিসার্চের co-author এবং National Marriage Project-এর পরিচালক। তিনি বলেন: 'আসলে মানুষ তো আলাদা আলাদা। যদি আপনার লক্ষ্য হয় পেশাগত এবং অর্থনৈতিক সাফল্য, তাহলে দেরিতে বিয়ে করাটাই আপনার জন্য বেস্ট। আর যদি সন্তান-সন্ততি নিয়ে ধার্মিক জীবন যাপনের চিন্তা করেন, তাহলে বিশের ঘরেই বিয়ে-সন্তান সেরে ফেলা উচিত।"

ঠিক এই পয়েন্টেই পুঁজিবাদী ভোগবাদী বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের বিরোধ। পশ্চিমা সভ্যতা কৃত্রিম দ্বীন (জীবনব্যবব্যবস্থা)। আর ইসলাম ফিতরাতের (সহজাত স্বভাবসুলভ) দ্বীন। পশ্চিমা সভ্যতার লক্ষ্য মুনাফা আর ভোগ, জুলুম-বঞ্চনাই এ সভ্যতার হাতিয়ার। ইসলামের লক্ষ্য ইহকাল-পরকালে মুক্তি, হাতিয়ার ইনসাফ ও অধিকার বুঝিয়ে দেয়া। পশ্চিমা সভ্যতা নারী-পুরুষের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, সাইকোলজির বিপরীত। আর ইসলাম সংগতিপূর্ণ। পশ্চিমা সভ্যতা উপর থেকে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে বিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকে। আর ইসলাম মানবসত্তাকে করে রাখে 'সহস্র বন্ধনের মাধ্যমে মহানন্দময়'। মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মিকভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে—যেটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

বিয়ের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়স, আয়-রোজগার, চাহিদা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির একটা সম্পর্ক আছে। দেরি করলে শারীরিক-মানসিক নানা সমস্যা। আবার আয়ের একটা বিষয় আছে, যেটা ইসলামে আরও বেশি জরুরি, কেননা ইসলাম পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণে বাধ্য করে। তাহলে ব্যালেন্সটা কীভাবে হবে? ব্যালেন্স ইসলাম করেই রেখেছে, ইসলামের লক্ষ্যই হলো ইনসাফ। মানুষ যেন তার নিজের বায়োলজি-সাইকোলজি দ্বারা আরেকজন মানুষ, পরিবার, সমাজের সাথে ইনসাফ করতে পারে, সে ব্যবস্থাপনা তৈরি করে দেয়াই ইসলামের উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত— > তিনি বলেন, 'কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের মতো) আর্থিক সামর্থ্য আমাদের ছিল না [১]।' রাসূল ﷺ বললেন, "হে যুব সমাজ! [২] তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই [৩] সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।"[১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন— > اللَّهُ يُغْنِهِمُ فقَرَاء يكُونُوا إِنْ وَإِمَابِكُمْ عِبَادِ كُمْ مِنْ وَالصَّلِحِينَ مِنكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنْ > 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও [৪] এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় [৫], তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে [৩] যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— > إِثْمُهُ فَإِنَّمَا إِثْمًا فَأَصَابَ يُزَوِّجُهُ وَلَمْ بَلَغَ فَإِنْ فَلْيُزَوِّجُهُ بَلَغَ فَإِذَا وَأَدَبَهُ اسْمَهُ فَلْيُحْسِنْ وَلَدٌ لَهُ وُلِدَ مَنْ أَبِيهِ عَلَى > 'তোমাদের মধ্যে যার কোনো (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালেগ অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয় [৬], তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালেগ হয় এবং তার বিয়ে না দেয় তাহলে সে কোনো পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে [৭]।'

ইসলাম হলো ফিতরাতের বিধান; মানবসত্তার জন্য যা যথোপযুক্ত এবং যা মানা সম্ভব, তাই বিধান করে দিয়েছে ইসলাম। এজন্য বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বয়স উল্লেখ না করে ইসলাম কয়েকটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে। এবং সেই শর্তগুলো অর্জন করার জন্য আশপাশের লোকদের দায়িত্ব দিয়েছে, একা ছেলেটার উপর ছেড়ে দেয়নি। উপরের তিনটা টেক্সট লক্ষ করলে যে পয়েন্টগুলো উঠে আসে—

[১] সামর্থ্যবান যুবকের বিয়ে করে ফেলা উচিত। [২] যুবসমাজ বলতে এখানে কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন, 'আমাদের লোকদের মতে, যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা বালেগ হয়েছে এবং ৩০ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি। অর্থাৎ নবীজি ﷺ মোটামুটি ১৩/১৪/১৫ থেকে নিয়ে ৩০-এর মধ্যে অবিবাহিত থাকাকে পছন্দ করেননি। [৩] যার সামর্থ্য একেবারেই নেই, তার রোযা রাখা দরকার; সামর্থ্য একটা শর্ত। শর্ত পুরা

না হলে রোযা। [৪] অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া সমাজের দায়িত্ব, সুতরাং, আবশ্যিকভাবে সামর্থ্যহীনকে বিয়ের শর্ত 'সামর্থ্য'-এর ব্যবস্থা করে দেয়াও—মানে, শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করাও—সমাজের দায়িত্ব। ইসলাম একটা কংক্রিট সমাজের কথা বলে, যার দায়িত্ব অনেক। বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার অনেক কনসেপ্ট ইসলামী সমাজের উপর বর্তায়। [৫] ন্যূনতম সামর্থ্য হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে সমাজ। বাকিটুকু আল্লাহ দেখবেন। [৬] বালেগ হলে (ছেলেদের স্বপ্নদোষ, মেয়েদের মাসিক ও দৈহিক পরিবর্তন, কোনো কিছু প্রকাশ না পেলে ১৫ বছর বয়স) পিতার দায়িত্ব বিয়ে দেয়া, যদি পিতার সামর্থ্য থাকে সন্তানকে সামর্থ্যবান করে দেয়ার। বালেগ হলে তাকে দ্রুত সামর্থ্যবান হবার শর্ত পূরণ করতে সাহায্য করবেন পিতা, এবং শর্ত পূরণ করে বিয়ে দেবেন। পিতা না পারলে সমাজ তাকে শর্ত পুরা করতে সাহায্য করবে। [৭] দেরি করলে সন্তানের গুনাহের দায়ভার পিতার উপর বর্তাবে। এমন সতর্কবাণীও এসেছে।

সবগুলো সামনে নিলে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম দ্রুত বিয়েকে বাধ্য করেনি— যেমনটা অনেকে বলে থাকেন। তবে বালেগ হবার পর দ্রুত সামর্থ্য অর্জন করে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে, এবং সেজন্য সমাজ ও পরিবারকেও দায়িত্ব দিয়েছে। যত দ্রুত সামর্থ্য অর্জন সম্ভব ও সামর্থ্য অর্জনের পর যত দ্রুত সম্ভব। নির্দিষ্ট না করে একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে ইসলাম-এর মধ্যে অবিবাহিত থাকা যাবে না। একই সাথে ইসলাম এই দুই শর্ত পুরা না হলে বিয়ে দেয়া যাবে না, তাও বলেনি। বালেগ বা বালেগা (তথা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে) হবার আগেও বিয়ে সম্পাদিত হতে পারে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য কেননা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আগে দেয়া লাগতেও পারে, যেমন— - মুমূর্ষু পিতা নাবালিকা মেয়েকে কারো দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চান। - দরিদ্র পিতা সমাজের প্রভাবশালীদের কুদৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে চান। বিয়ে দিয়ে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। - দারিদ্র্যের কারণে কন্যার ভরণপোষণ দিতে না পারা। যেটা আমাদের দেশে মূল কারণ হিসেবে প্রস্ফুটিত। - সন্তান বিগড়ে যাবার ভয়ে। ইত্যাদি।

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা একসাথে না থাকতে চাইলে তারও রাস্তা আছে (খিয়ারে বুলুগ-এর বিধান)। বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা দ্রুত, ইসলাম সেটার নির্দেশ করেছে। এজন্যই পরিস্থিতি-সাপেক্ষে বিয়ে কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নাহ, কারো জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য মুবাহ, এমনকি কারও জন্য হারাম। এটা নির্ণিত হয় ব্যক্তির অবস্থা সাপেক্ষে। ঢালাওভাবে বাল্যবিবাহ অবৈধ করাটা যেমন সমাধান নয়, বিশেষত আমাদের মতো 'গরীব-অধ্যুষিত' 'নারীর জন্য অনিরাপদ' দেশে; আবার ১৫/১৬/১৭ বছর বয়সী কিংবা পর্নোগ্রাফি ও বলিউডি সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়ে সব বুঝে ফেলে যৌন চাহিদা তৈরি হয়েছে যাদের, তাদেরকে জোর করে নাদান শিশুর কাতারে ঢুকিয়ে দেয়াও বাস্তবসম্মত নয়। সেই সাথে গণহারে নাবালেগ বা সদ্য বালেগদের বিয়ে দিতে জোরাজুরি করাও সমাধান নয়। সমাধান দিয়েছে ইসলামই, পরিস্থিতি-সাপেক্ষে যেটা প্রযোজ্য, আলিমদের পরামর্শে সেটা করা।

তাছাড়া ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— > 'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে যেটা সহজে সম্পন্ন হয়।' > 'যে বিবাহে খরচ কম, তা-ই বেশি বরকতপূর্ণ।' > 'যে সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সহজ হয়ে যায়।' নবী ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে— সহজসাধ্য মোহরানা।'

- **ছেলেপক্ষ:** সামর্থ্যের মধ্যে মোহর। লৌকিকতা-বর্জিত ওয়ালীমা।
- **মেয়েপক্ষ:** যৌতুক নেই। ওয়ালীমা ছেলেপক্ষের, মেয়েপক্ষের দায় নেই।
- বাগদান, পানচিনি, গায়ে হলুদের মতো অপচয় বিবর্জিত।

কতটা সহজ করা হয়েছে তা বুঝাতে মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধের কিছু অংশ আপনাদের খিদমতে তুলে দিচ্ছি— > ...সুতরাং এর জন্য খুব বেশি আচার-বিচার, উদ্যোগ-আয়োজন ও জাঁকজমকের দরকার হয় না। নেই কঠিন কোনো শর্ত ও দুর্ভর ব্যয়ের ঝক্কি। খরচ বলতে কেবল স্ত্রীর মোহর। আর আচার-অনুষ্ঠান বলতে কেবল সাক্ষীদের সামনে বর-কনের পক্ষ হতে ইজাব-কবুল। ব্যস, এতটুকুতেই বিবাহ হয়ে যায়। অতপর ওয়ালীমা করা সুন্নত ও পুণ্যের কাজ বটে, কিন্তু বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। এ ছাড়া প্রচলিত কিছু কাজ কেবলই জায়েয পর্যায়ের। তা করা না করা সমান। করলেও কোনো অসুবিধা নেই, না করলেও দোষ নেই। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়া-না হওয়া কিংবা উত্তম-অনুত্তম হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। উভয় পক্ষের জন্য এতটাই সহজ করা হয়েছে যাতে সমাজ ও বাবার পক্ষে পাত্রকে দ্রুত সামর্থ্যবান করা এবং পাত্র নিজেকে সামর্থ্যবান মনে করা সহজ হয়।

পাত্রী নির্বাচন

ইসলাম পরিবার গঠনের জন্য বিবাহকে অত্যাবশ্যকীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা তো করেছেই, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্যও প্রণয়ন করেছে কিছু বিধিনিষেধ এবং নিয়মাবলি। মানুষ যদি ঈমানের সাথে সেগুলো মেনে নিয়ে জীবন গঠন করতে পারে, তাহলে দাম্পত্যজীবন হবে মনকষাকষি-মুক্ত, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, চোখজুড়ানো, মনমাতানো।

প্রতিটি মুসলিম যুবকের মনের গহীন বাসনা হচ্ছে একজন পুণ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পাওয়া। যুবক নিজে যদি ফাসেকও হয়, যিনাকারীও হয়, সেও চায় তার স্ত্রী হিজাবী হোক, ধার্মিক হোক, নম্র-ভদ্র হোক। আকাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য ইসলাম প্রণয়ন করেছে অভিনব এক পদ্ধতি। নবী কারীম ﷺ বলেন— > لِأَرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ: وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا يَدَاكَ تَرِبَتْ الدِّينِ، بِذَاتِ فَاظْفَرْ وَلِدِينِهَا، > 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।"

পাঠক, আমার সাথে সাথে আপনিও একটু ভাবুন। নবী কারীম ﷺ আপনাকে প্রতীক্ষিত জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' আর আল্লাহ তাআলা নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন- > عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ تُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا > 'যদি নবী তোমাদের সকলকেই পরিত্যাগ করেন তাহলে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে এর পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারী, ইবাদাতগোজার, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।'

আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র আয়াতেও মুমিন স্ত্রীর বিশেষ গুণটির (দ্বীনদারি) কথা উল্লেখ করেছেন, যা স্ত্রীর মধ্যে সবাই চায়। তাহলে সেই বিশেষ গুণটির গ্রহণযোগ্যতা কী পরিমাণ, চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যেটাকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন, নবীজি ﷺ যে গুণের অভাবে সাহাবীদেরকে দিয়েছেন ক্ষতির সতর্কবাণী! তাই দাম্পত্যজীবনে অনাহূত ক্ষতি থেকে বাঁচতে স্ত্রী নির্বাচনের জন্য সর্বাগ্রে দেখা দরকার সেই বিশেষ গুণটি—'দ্বীনদারি'।

বিয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ

পাঠক, পাত্রীর বিশেষ বৈশিষ্টাবলি শোনার জন্য আপনি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এর আগে আমরা আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। একে তাঁরা খাটো করে দেখেন। বিয়েকে যে বিশেষ উপকারিতার জন্য মানুষের জীবনে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা সেই বিশেষ উপকারিতার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন।

তাঁরা বিয়েকে নারীদেহ ভোগ করা এবং শুধুই শারীরিক তৃপ্তির মাধ্যম মনে করেন। আবার কেউ মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যম এবং সন্তানের আধিক্য নিয়ে আস্ফালন মাত্র। কেউ দেখা যাচ্ছে মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানো, নেতৃত্বদান এবং জনবলে নিজের দল ভারী করার এক মুখ্য সুযোগ। কেউ আবার মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং মুমিনদের জনবল বৃদ্ধি পাওয়া। কেউ বৈবাহিক সম্পর্ককে শুধুমাত্র নিজেদের বাপ-দাদার পালন করে আসা প্রথা হিসেবেই নিয়ে থাকেন।

খুব অল্প-সংখ্যক মানুষই এ ব্যাপারে সুবোধ জ্ঞান রাখেন। যারা জ্ঞান রাখেন, তাঁরা মনে করেন, বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে বিশেষ এক প্রতিনিধিত্ব, অগাধ দায়িত্ববোধ, দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা, মানবিক সৌভাগ্যের পথে আত্মত্যাগ এবং জীবনকে নিরাপদ গতিপথে পরিচালনা করার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন- > يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ > 'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।'

এক. দ্বীনদারি

পুণ্যবতী পাত্রীর বিশেষ গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দ্বীনদারি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন- > خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ مِّن > 'একজন মুমিন দাসী মুশরিক (স্বাধীনা) মেয়ের চেয়ে উত্তম। যদিও সেই মুশরিক (স্বাধীনা) মেয়ে তোমাদেরকে (স্বীয় গুণাবলির মাধ্যমে) আকৃষ্ট করে।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন— > لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ > 'পুণ্যবতী নারীদের জন্য (আমি নির্ধারণ করে রেখেছি) পুণ্যবান পুরুষ। আর পুণ্যবান পুরুষদের জন্য (নির্ধারণ করে রেখেছি) পুণ্যবতী নারী।'

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন— > اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ > 'নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত; এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালেও তারা সেটার হেফাজত করে।'

নবী কারীম ﷺ-ও সতর্ক করে বলেছেন যে, দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে দাম্পত্যজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনদারি বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণত আমরা দ্বীন-ইসলামের পরিপূর্ণ সমঝদারি, ইসলামের ফযীলতপূর্ণ বিষয়াবলি এবং এর সমুন্নত শিষ্টাচারিতার কার্যত রূপ দান করাকেই বুঝে থাকি। মূলত এসব কারণেই নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহী হও। ফলে ছেলেরা (দ্বীনদার মেয়েকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে) দাম্পত্য জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে। মেয়েরাও স্বামী, সন্তান এবং পরিবারের অধিকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে।'

ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও সৌন্দর্যের ওপর দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ—

নবী কারীম ﷺ ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও সৌন্দর্যের ওপর দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এগুলো নশ্বর দুনিয়ার মতোই অনিত্য। পাঠক, আল্লাহ তাআলার কাছে শুধুমাত্র আপনার স্ত্রীর দ্বীনদারিই আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

এ-কারণেই নবী কারীম ﷺ বলেন— > الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الصَّالِحَةُ الْمَرْأَةُ > 'দুনিয়া হচ্ছে উপভোগ্য সম্পদে পরিপূর্ণ। আর এখানে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।'

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সোনা-রুপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "তাহলে আমরা কোন সম্পদ ধরে রাখব?" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো।" অতঃপর তিনি তার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পেছন পেছন গেলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব?" নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন— > عَلَى أَحَدَكُمْ تُعِينُ مُؤْمِنَةً، وَزَوْجَةً ذَاكِرًا، وَلِسَانًا شَاكِرًا، قَلْبًا أَحَدُكُمْ لِيَتَّخِذَ الْآخِرَةِ أَمْرِ > "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী অর্জন করে।"

অন্য বর্ণনায় আছে, মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবী কারীম ﷺ বলেন— > شَاكِرٌ، قَلْبٌ النَّاسُ اكْتَنَزَ مَا خَيْرُ وَدِينِكَ دُنْيَاكَ، أَمْرِ عَلَى تُعِينُكَ صَالِحَةٌ وَزَوْجَةٌ ذَاكِرٌ، وَلِسَانٌ > 'কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা আর পুণ্যবতী স্ত্রী, যে তোমাকে ইহকাল-পরকালের কার্যাবলি আঞ্জাম দিতে সহায়তা করে—এ সবই হচ্ছে মানুষের সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের মাঝে সর্বোত্তম রত্ন।'

মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের মুখ্য বিষয় তিনটি। সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী কারীম ﷺ বলেন— > '(জীবনের অন্যতম) সৌভাগ্য হচ্ছে, একজন পুণ্যবতী স্ত্রী পাওয়া, যাকে দেখলেই তোমার হৃদয় প্রফুল্ল হবে। অনুপস্থিতির সময়ও তুমি স্বীয় ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে। আর (জীবনের) দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এমন স্ত্রী পাওয়া, যাকে দেখামাত্রই অন্তরে বিতৃষ্ণ ভাবের উদয় হয়। তোমার বিরুদ্ধে তার কটুবাক্য ধেয়ে আসতে থাকে। তোমার আড়ালে তুমি স্বীয় ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীর ব্যাপারে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকো।'

বাস্তবতা হলো, স্ত্রীর কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর জন্য দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যদি সৌন্দর্যের সাথে বদচলন ও মুখরা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর গায়ের চাপা রং স্বামীর সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়—সে আত্মগরিমা-হীন, মিষ্টভাষী, দ্বীনদার এবং উঁচু বংশীয় হওয়ার কারণে। মূলত এসব কারণেই নবী কারীম ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীর গুণাগুণ স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

অনেক যুবক শুধু সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ করে এমন কিছু জোরালো শর্ত আরোপ করে, যা কেবল অভিনেত্রী/মডেলদের মাঝেই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আপনারা সৌন্দর্যের শর্ত আরোপ করবেন, এটা দোষের কিছু নয়; সুন্দরী পাত্রী খুঁজবেন, এটা নিন্দার কোনো বিষয় নয়; কিন্তু দ্বীনদারি এবং সৌন্দর্যের মাঝে যখন বৈপরীত্যের সৃষ্টি হবে (সৌন্দর্য আছে দ্বীনদারি নেই, কিংবা দ্বীনদারি আছে সৌন্দর্য নেই।) তখন কোনটাকে গ্রহণ করবেন? এটিই চিন্তার বিষয়।

এখনকার মানুষ চোখের হেফাজত করে না। বিভিন্ন ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায়, সিনেমায়, সিরিয়ালে, রাস্তাঘাটে নানাবিধ রঙচঙে জিনিস দেখে। ফলে স্বাভাবিক বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। কারণ, দীর্ঘক্ষণ কৃত্রিম চাকচিক্যের মাঝে ডুবে থাকলে এবং চোখের হেফাজত না করলে কাছের স্বাভাবিক সৌন্দর্যতেও আর মন টেকে না। বিশেষ করে বর যখন পাত্রীকে দেখতে যায় বা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়, মনে প্রবল আকার ধারণ করে এই অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা। রাস্তাঘাটে, পেপার-পত্রিকায় নারীর সৌন্দর্যের দিকে অপলক চেয়ে থাকার ফলে এবং নাটক-সিনেমা-সিরিয়ালের অভিনেত্রীদের কৃত্রিম চেহারা এইসব পুরুষের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। ফলে তাদের মনে এই অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। বিবাহিত জীবনেও তারা শান্তি পায় না। মনের এই খুঁতখুঁতে অনুভূতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে কেবল ইসলাম। শরীয়তপ্রণেতা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ দৃষ্টি হেফাজতের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যদি কেউ অনুসরণ করে, তাহলে বাস্তবেই সে নিজ স্ত্রীর প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ও দাম্পত্য সুখের বেহেশতী অনুভবে ঋদ্ধ হবে।

যদি তুমি ফাতিমার মতো জীবনসঙ্গিনী পেতে চাও তাহলে আলীর মতো হতে চেষ্টা করো।

কিছু যুবক আসন্ন বৈবাহিক জীবন নিয়ে বিচলিত-বিব্রত। তাদের প্রশ্ন : এই চাকচিক্য, কৃত্রিমতা আর বেহায়াপনার যুগে পুণ্যবতী স্ত্রী কীভাবে পাবো? ধেয়ে আসা ফিতনার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপর্যয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী কারীম ﷺ বলেছেন— > مَنْ السَّاعِي، مِنَ خَيْرٌ فِيهَا وَالْمَاشِي الْمَاشِي، مِنَ خَيْرٌ فِيهَا وَالْقَائِمُ الْقَائِمِ، مِنَ خَيْرٌ فِيهَا الْقَاعِدُ فِتَنٌ سَتَكُونُ بِهِ فَلْيَعُذْ مَعَاذًا، أَوْ مَلْجَأً، مِنْهَا وَجَدَ فَمَنْ تَسْتَشْرِفْهُ، لَهَا تَشَرَّفَ > 'শীঘ্রই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে (উঁকি মেরেও) তাকাবে ফিতনা তাকে ঘিরে ধরবে। তখন কেউ যদি আশ্রয়ের কোনো জায়গা কিংবা নিরাপদ কোনো স্থান পায়, তাহলে সে যেন সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।'

আমাদের পূর্বসূরিদের একজন এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি তুমি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মতো পুণ্যবতী স্ত্রী পেতে চাও, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো পুণ্যবান হয়ে যাও।' পাঠক, এত এত কৃত্রিমতার মাঝে, দ্বীনের খোলসে বদদ্বীনীর মাঝে প্রকৃত পুণ্যবতীর খোঁজ আপনার কাছে নেই, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে আছে। তাঁর খবরের বাইরে কিছু নেই, তিনি জানেন কে আপনার নয়ন জুড়াবে, আপনার নয়ন-জুড়ানো পুণ্যবতীর সন্ধানের কোনো অভাব নেই তাঁর কাছে। সুতরাং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ুন। নৈকট্যের স্তর অনুযায়ী তিনিই আপনার জন্য পুণ্যবতী স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেবেন; যে স্ত্রী দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে আপনার সহযোগী হবে, যার উসীলায় আপনি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাবেন আরও দ্রুত, আরও বেগবান হয়ে।

যুবকদের ক্ষেত্রে যেকথা বলা হলো, ঠিক একই নির্দেশনা যুবতীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন— < مِمَّا مُبَرَّءُونَ أُولَئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ الْخَبِيثَاتُ كَرِيمٌ وَرِزْقٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُم يَقُولُونَ > 'দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য। এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য। এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, সেগুলোর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে তাদের জন্য।"

তাই মানুষ যত বেশি নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে এগোবে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টার মাত্রা অনুযায়ী তত বেশি পুণ্যবতী স্ত্রীর ব্যবস্থা তার জন্য করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। এজন্যই তো মানুষ যখন জান্নাতে আল্লাহর একদম চূড়ান্ত নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন তিনি তাদের জন্য মিলিয়ে দেবেন পরমা সুন্দরী, আয়তলোচনা ও সোহাগিনী অপ্সরীদের। সুবহানাল্লাহ।

যুবকের মনস্কামনা

এই তো কিছুদিন আগে কয়েকজন যুবকের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম। তারা কেমন স্ত্রী চায়। তাদের স্ত্রীর ভেতর কী কী গুণ পেলে, তারা সন্তুষ্ট হবে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন এসেছে। তাদের কেউ কেউ কিছু বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে নিয়েছে। আবার কেউ কেউ এখনও বাধ্যতামূলক হিসেবে নেয়নি। গুরুত্বপূর্ণ উত্তরগুলো আপনাদের সামনে পেশ করছি।

- **প্রথম জন:** 'আমি চাই সতীসাধ্বী এমন একজন স্ত্রী, যে নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে।'
- **দ্বিতীয় জন:** 'আমি চাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, পাশাপাশি সে হতে হবে দুনিয়ার সকল বিষয়ে অগাধ অভিজ্ঞতাসম্পন্না।'
- **তৃতীয় জন:** 'আমার স্ত্রী হতে হবে লাস্যময়ী গড়নের। স্বামী-সন্তানের প্রতি যৎনশীলা।'
- **চতুর্থ জন:** 'আমার স্ত্রী হবে নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী। অর্ধপ্রস্ফুটিত স্তনযুগল। যৌনাঙ্গে প্রচ্ছন্ন আহ্বান। ফর্সা ত্বকে রক্তনালি যেন দৃশ্যমান। কামকলা-পটিয়সী। এবং স্বর্ণকেশী।'
- **পঞ্চম জন:** 'আমার স্ত্রী হবে সর্বগুণে গুণান্বিতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর। লাবণ্যময়ী, অঙ্গশোভায় অপরূপা। বিয়ের পর আমার চোখই যেন না সরে।'

তাদের মধ্য থেকে একজনই কেবল বলল : 'আমি দ্বীনদার স্ত্রী চাই। কারণ, নবী কারীম ﷺ বলেছেন— দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এই ছিল আমার অনুসন্ধানে কজন যুবকের পছন্দ, তাদের চোখে 'মনের মতো স্ত্রীদের 'কনফিগারেশন'। এদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে, বলুন তো? নিশ্চয় শেষের জন। সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চায় না। রূপ, সম্পদ, বংশ-সব কিছুরই নেগেটিভ একটা দিক আছে। অধিক রূপ, অধিক সম্পদ, অধিক বনেদি— সংসার-জীবনকে বিষিয়েও তুলতে পারে। কিন্তু দ্বীন এমন এক বৈশিষ্ট্য যা যত বেশি হবে, ততই স্বামীর জন্য প্রশান্তিদায়ক। দুনিয়াতে এই স্ত্রীর কারণে যেমন সে প্রশান্ত থাকবে, তেমনি আখিরাতের চির-প্রশান্তির দিকেও এই স্ত্রী তাকে ঠেলে দেবে। চালাক ছেলেটি তাই নবী কারীম ﷺ-এর নির্দেশকে সামনে রেখেছে—'দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।'

মঙ্গলগ্রহের মেয়ে

শাইখ আহমাদ আল-কাত্তান হাফিজাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের প্রথাগত সমাজব্যবস্থা এবং আবহমান ঐতিহ্য তালাকপ্রাপ্তা নারীকে চরম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আসছে। বিধবা, খানিকটা শ্যামবর্ণ কিংবা সমাজের ভাষায় কালো মেয়ের প্রতিও চিত্রটা একইরকম। সমাজ যেন তাদেরকে আজীবন আইবুড়ো হয়ে কুঁকড়ে থাকার দণ্ড দিয়ে বসে আছে। একেকজন তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, শ্যামলা কিংবা সমাজের ভাষায় কালো মেয়েগুলো যেন মস্ত অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি। সমাজের গড়ে তোলা অদৃশ্য চৌদ্দ শিকের মাঝে পুরে রেখেও যাদের উপর চলে কড়া নজরদারি।

যেমন ধরুন— বিবাহ-প্রত্যাশী কোনো ছেলে বলল, 'আমি একজন পুণ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করব।' তার বন্ধু বলল, 'তাহলে তুমি অমুক মেয়েকেই বিয়ে করো। সে খুব ভালো মেয়ে।' বিবাহ-প্রত্যাশী ছেলে প্রত্যুত্তরে বলল, 'না না, কী বলো, তুমি! তাকে কেন বিয়ে করব? সে তো তালাকপ্রাপ্তা।' বন্ধু খানিকটা জোরালো গলায় বলল, 'তবুও সে পুণ্যবতী মেয়ে। তার স্বামী ছিল বেনামাযী মদখোর। বহু চেষ্টা করেও তার বদ-খাসলতকে স্ত্রী শোধরাতে পারেনি। অবশেষে

স্বামীর পরিশুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়ে অনন্যোপায় হয়ে তালাক নিয়ে নিয়েছে। এই হলো তার তালাকের কারণ। তার নিজের কমতি কীসে, বলো! একজন স্বামী তার স্ত্রীর মাঝে ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারির যা যা আশা করে সবগুলোই তো রয়েছে তার মাঝে।' ছেলেটি এবার তেতে উঠল, 'আমি কোনো তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা এবং পূর্বে-প্রেমের-সম্পর্ক-থাকা মেয়েকে বিয়ে করব না। যদি তাদের বিয়ে এবং তালাকের মাঝে মাত্র কয়েক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়, তবুও না। আমি চাই সতীসাধ্বী কুমারী মেয়ে। সে আমার সাথে রঙঢঙ করবে, আমি তাকে নিয়ে সুখের সাগরে ভাসব।' কোমল কণ্ঠে বলল বন্ধুটি, 'বিয়ের উদ্দেশ্য কি শুধু রঙঢঙ করা? নবী কারীম ﷺ-এর হাদীসের উদ্দেশ্য কি এই যে, সমাজে এমন কুপ্রথার প্রচলন ঘটবে? তাহলে তো বিনা দোষে, বিনা কারণে স্বামীহীনা থেকে যাবে শত-সহস্র মেয়ে। "তুমি শোনোনি, জনৈক ব্যক্তি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত নবী কারীম ﷺ-এর সকল স্ত্রী হয় তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, নয়তো বিধবা।" বরং তিনি মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাশে থাকার কারণে, যিনি ছিলেন একজন বিধবা। আজীবন তাঁর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করে গেছেন নবীজি। আচ্ছা বন্ধু, তুমি কেমন মেয়ে চাইছ বিয়ের জন্য, বলো?'

বিবাহ-প্রত্যাশী ছেলেটি গোমড়ামুখে বলল, 'আমার শর্তের ফিরিস্তি বেশ লম্বা। আমার স্ত্রী দেখতে পরমাসুন্দরী এবং দীর্ঘ-তনু হবে; হরিণ-শাবকের মতো চপল হবে, ময়ূরের মতো থাকবে তার চোখ জুড়ানো গড়ন। নিশ্চুপ থাকবে, কিন্তু তাকালে মনে হবে যেন হাসছে। আর যদি হাসে, তাহলে মনে হবে যেন কাছে ডাকছে। কোকিলের মতো কিন্নরকণ্ঠ আর ফর্সা ত্বকের উজ্জ্বলতা ব্যাবিলনের জাদুকরদের মতো আমাকে মোহিত করে রাখবে। 'দূর থেকে দেখলে তাকে মনে হবে ফুলের মতো কমনীয়। কাছে গিয়ে দেখলে মনে হবে ফুলের পাপড়ির মতো পেলব কোমল। অপ্সরার মতো ডাগর ডাগর আঁখি। (ছিপছিপে শরীরের দরুণ) সে বসে থাকলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ালে মনে হবে কোথাও আরোহণ করে আছে। সে হতে হবে এমন যে-সে মূলত ছিল বিত্তশালী। পরবর্তীতে দারিদ্র্য তাঁকে পেয়ে বসেছে। বিত্তবানদের আত্মমর্যাদাবোধ আর দরিদ্রের লাঞ্ছনার অনুভূতি—দুটোই থাকবে তার। সে হবে সহিষ্ণু বিদূষী এবং প্রজ্ঞাবতী বাগ্মী। যার সৌন্দর্যে আমি প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করব। রেশমের মতো সোজা, মেঘের মতো ভরাট কেশবতী। রূপ যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, রাতে এক-রকম দেখতে তো দিনে আরেক রকম। মানুষ তার থেকে শিখবে মমতা-শ্রদ্ধা-নম্রতা। প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি। ছোটদেরকে স্নেহ। গুরুজনদের শ্রদ্ধা। আরও অনেক কিছু...!'

বন্ধুটি তটস্থ হয়ে বলল, 'রোসো রোসো বন্ধু, আর না। ব্যস, থামো এবার। আর বলতে হবে না। তুমি, দোস্ত, যে বিবরণ দিলে, এমন মেয়ে পাওয়ার জন্য রাজারা নিজের রাষ্ট্র বিকিয়ে দেবে। তারপরেও তার মূল্য চুকানো সম্ভব না। আরে মিয়া! তোমার আহামরি শর্তগুলোর লোভ সামলাও। পাত্রীপক্ষ তো তোমার মাঝে শুধু দ্বীনদারি আর বিশ্বস্ততা থাকাটাই শর্ত করেছে। বাড়িতে আয়না আছে? নিজের চেহারাটা দেখেছ কখনো? বাড়ি যাও। আয়নায় নিজের চেহারাখানা একটু দেখো। তুমি যেসব গুণের চাহিদাপত্র দিলে, এগুলোর একটিও যদি তুমি নিজের মাঝে পাও; তাহলে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব মঙ্গলগ্রহের (কল্পরাজ্যের) মেয়ের কাছে।'

দুই. সচ্চরিত্র

একাগ্রচিত্তে ও লাগাতার দ্বীনের কাজ করার জন্য স্ত্রী সচ্চরিত্রা হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। মুখরা, দুশ্চরিত্রা ও অকৃতজ্ঞ নারী পুরুষের মনকে সারাদিন অশান্ত করে রাখার জন্য যথেষ্ট। এটা তো জানা কথাই যে— > عَلَى وَالصَّبْرُ الْأَوْلِيَاءُ بِهِ يُمْتَحَنُ مِمَّا النِّسَاءِ لِسَانِ > 'মুখরা স্ত্রীর তির্যক জবান দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়।' তাহলে বুঝুন, এটা কতবড় পরীক্ষা!

তিন. সৌন্দর্য

সৌন্দর্যের ভক্ত সবাই। কে না চায়, আমার বউটা সুন্দরী হোক। স্ত্রীর সৌন্দর্য পরকীয়ার মতো কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার উসীলা হয়। এ কারণেই বিয়ের আগে পাত্রী দেখে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নবীজি ﷺ। কারণ হিসেবে

বলেছেন, এতে পারস্পরিক পছন্দের দ্বারা ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়। তবে কিছু আল্লাহর ওলী আছেন, যাঁরা পার্থিব কোনো সৌন্দর্যের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করেন না, এবং বিবাহের পেছনে দেহ ভোগ করাও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। তারা বিয়ে করেন আল্লাহর হুকুম ও নবীজির ﷺ সুন্নত পুরা করার জন্য। যেমন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সুস্থ-সবল মেয়েকে বিয়ে না করে বিয়ে করেছিলেন তাঁরই নিকটাত্মীয় এক অন্ধ নারীকে। তবে এমন ঘটনা বিরল।

যদি দ্বীনদারির সাথে অতিরিক্ত হিসেবে পাত্রী সুদর্শনা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এবং সম্পদশালী হয়, তাহলে সে কম-সুন্দরী দ্বীনদার মেয়ে থেকে উত্তম। অর্থাৎ, দ্বীনদারি যদি একই স্তরের হয়, তবে সুশ্রী নারী গড়পড়তা চেহারার মেয়ে থেকে উত্তম। আবার, দ্বীনদারি যদি একই স্তরের হয়, সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়ে উত্তম অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশীয় মেয়ে থেকে। দ্বীনদারি থাকতে হবে আগে, এরপর যা যা অতিরিক্ত পাওয়া গেল তা বোনাস, আলহামদুলিল্লাহ।

চার. অভিজাত বংশের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বাছাই করা

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে পছন্দ করে নেওয়ার জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যে—'জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী যেন সম্ভ্রান্ত বংশের হয়। যে বংশের শিষ্টাচার, আতিথেয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা লোকমুখে শোনা যায়। সমাজে তাদের মান-সম্মান এবং বংশীয় গুণকীর্তনের কথা লোকমুখে জারি থাকে।' মানুষ হচ্ছে খনির মতো। তাদের মাঝে বংশগত পার্থক্য থাকবেই।

এমন পাত্রী বাছাই করা উচিত, যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছে এবং উত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে উঠে এসেছে, পাশাপাশি বদান্যতায় প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তির ঔরসে যার জন্ম। এক্ষেত্রে রহস্য হলো 'ফ্যামিলি কালচার'। যেমন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে মেয়েটি বেড়ে উঠেছে, আশা করা যায় তার মন-মানসিকতা-চিন্তাধারাও তেমনি গড়ে উঠেছে। যেমন বংশীগত আলিম পরিবারের মেয়ে, বা বংশের অনেকেই ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত, বা বংশে শিক্ষিত দীনদ্বার মানুষ বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এমন মেয়ে পরিবারে ভদ্রতা ও ইসলামী মননশীলতার শিক্ষা পায়। তারা সচ্চরিত্রা ও আদর্শবতী মায়ের দুধ পান করে। দ্বীনদার দাদা-নানা-বাবা-চাচা-মামার কোলে বড় হয়। ফলে প্রগাঢ়ভাবে ধারণা করা যায়, মেয়েটিও ইসলামের চেতনার বাহক হবে। উসমান ইবনু আবিস সাক্বাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদেরকে বউ করে আনার জন্য। এবং কুখ্যাত বংশের মেয়েদের থেকে দূরে থাকার ওসীয়ত করে গেছেন। ওসীয়তনামায় তিনি বলেছেন— > আমার বিয়ের উপযুক্ত সন্তানেরা, কিছুদিন পরেই যারা ফসল ফলাবে (বংশবিস্তার করবে)। শোনো, প্রতিটি ব্যক্তির (ফসল ফলানোর আগে) দেখে নেওয়া দরকার সে কোথায় ফসল ফলাচ্ছে। অর্থাৎ সে কাকে বিয়ে করছে? দাগি বংশোদ্ভূত মানুষগুলো খুব কমই সম্ভ্রান্ত হয়। সুতরাং বিয়ের আগে যাচাই-বাছাই করো। যদিও এতে কিছু সময় ব্যয় হবে, তবুও ভালো।

সন্তানের জন্য আপনি কেমন মা নির্বাচন করলেন, এটা আপনার উপর অনাগত সন্তানের অধিকার। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁরই এক ছেলে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, বাবার প্রতি সন্তানের অধিকার কী?' তিনি বলেছিলেন, 'সর্বপ্রথম অধিকার হলো, সন্তানের মাকে উত্তমভাবে নির্বাচন করে বিয়ে করা। পরবর্তীতে সন্তানের ভালো একটি নাম রাখা। এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।'

পাত্রী যাচাই-বাছাই কতটা জরুরি, পিতা-পুত্রের এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট।

পাঁচ. স্বল্প দেনমোহরে বিয়ে সম্পন্ন করা

বিয়ের মাঝে কল্যাণের উৎস হচ্ছে স্বল্প দেনমোহর, এটা থেকেই বিয়ের বাকি সব কল্যাণ-বারাকাহ প্রশান্তির ফল্গুধারা জারি হয়। নবী কারীম ﷺ বলেছেন— > أَيْسَرُهُ النِّكَاحِ خَيْرٌ > 'স্বল্প খরচের (দেনমোহরের) বিবাহ সর্বোত্তম।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারীম ﷺ চারশো দিরহামের বেশি দেনমোহর দিয়ে নিজেও বিয়ে করেননি এবং কোনো মেয়ের বিয়েও দেননি।' যদি বিয়ের দেনমোহরের আধিক্য সম্মান লাভের কোনো কারণ হতো, তাহলে এ-কাজটি নবী কারীম ﷺ অবশ্যই করতেন। নবীজির ﷺ বেশ কজন সাহাবী দেনমোহর হিসেবে এক-টুকরো স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে করেছেন। যার মূল্য ছিল মাত্র পাঁচ দিরহাম।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ দুই দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর রাতে মেয়েকে নিজে নিয়ে গিয়ে স্বামীর বাড়ি দিয়ে এসেছেন। নবী কারীম ﷺ বলেছেন— > إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا > 'সৌভাগ্যবান মেয়ে সে, যার পাণিপ্রার্থী কম হয়, বিয়ের দেনমোহর হয় স্বল্প পরিমাণের এবং আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও সীমিত।'

ছয়. ভিন্ন গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করা

পাত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরও একটি নির্দেশনা হচ্ছে, নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং স্ববংশীয় মেয়েদের বিয়ে না করে ভিন্ন গোত্রীয় মেয়েদেরকে বিয়ে করা। এতে মুসলিমদের মাঝে সামাজিক বন্ধন জোরালো হয়। বংশে বংশে আত্মীয়তা বাড়ে। পারিবারিক পরিচিতির ছক প্রশস্ত হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে সন্তান হেফাজতে থাকে। প্রজন্মের দৈহিক গঠন-সহ অন্যান্য যোগ্যতায় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করে।

সায়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পরিবারের প্রতি লক্ষ করে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'তোমরা দুর্বল হয়ে পড়েছ। তাই প্রতিভাসম্পন্ন বংশে (অর্থাৎ অন্য বংশে এবং প্রবাসীদেরকে) বিয়ে করো।' তিনি এও বলেছেন, 'নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বিয়ে করো না। কারণ, এক্ষেত্রে দুর্বল সন্তানের জন্ম হয়।'

ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স-এর ভাষায়, মা-বাবার চাচাতো-ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েদের বিয়েকে (second cousin) বলা হয় consanguineous marriage। এর ভেতরে আপন চাচাতো-ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ভাইবোনের (first cousin) বিয়েও পড়ে। মানে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড কাজিনের সাথে বিয়েকে Consanguineous marriage বা নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিয়ে' বলা হয়। কিছু বিশেষ জন্মগত অসুখ আছে (autosomal recessive disorders), যেগুলো এমন বাবা-মায়ের সন্তানদের হতে পারে। যেমন— - Sickle cell disease - Cystic fibrosis (CF) - Tay-Sachs disease - Gaucher disease - Fanconi Anemia - Hartnup's Disease - Kartagener's Syndrome - Pyruvate Dehydrogenase Deficiency - Xeroderma Pigmentosum - Congenital Fructose Intolerance - Galactosemia - Glycogen Storage Disease Type I, II, III, V - Ataxia-Telangiectasia - Severe Combined Immunodeficiency (SCID) - Niemann-Pick Lipidosis - Albinism - Alkaptonuria - Homocystinuria - Maple Syrup Urine Disease - Phenylketonuria (PKU) - Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD)

তবে এই রিস্কের পরিমাণ কেমন? যেমন ফার্স্ট কাজিন বিয়ের ক্ষেত্রে এসব অসুখের রিস্ক ১.৭% থেকে ২.৮% বেশি। মানে খুব বেশি না। আবার জন্মত্রুটির কোনো রিস্কই নাই, এমনও রিসার্চ এসেছে। মৃত শিশু জন্মের সম্ভাবনা ১.৭ গুণ বেশি। শিশুমৃত্যু স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১% বেশি। মূলত এর কারণ হলো একই পূর্বপুরুষে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা জিনের মাধ্যমে মা-বাবা দুজনের কাছ থেকেই পেয়ে এই শিশুতে আবার শক্তিশালী হয়ে যায়, যেহেতু দাদা-নানা লেভেলে বা বাপ-মা'র দাদা-নানা লেভেলে গিয়ে জিন সেই একজনেরই। আরেক রিসার্চে এসেছে, সেকেন্ড কাজিনে যে রিস্ক, আর অনাত্মীয়দের বিয়েতে যে রিস্ক, তা একই রিস্ক, পার্থক্য নেই।

তবে উচ্চরক্তচাপ, সিজোফ্রেনিয়া, হৃদরোগ, ডায়বেটিস, অটিজম, ক্যান্সার— এসব অসুখের সাথে পারিবারিক ইতিহাসের একটা সম্পর্ক আছে। ফলে নিকটাত্মীয়-বিয়ের সাথে এগুলোরও একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যদিও এমন স্পষ্ট রিসার্চ এখনও অপ্রতুল।

সাত. কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরও একটি নির্দেশনা হচ্ছে, অকুমারী মেয়েকে বিয়ে না করে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা। এর প্রভূত তাৎপর্য এবং অগাধ উপকারিতা রয়েছে।

কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার উপকারিতা

একজন কুমারী মেয়ের হৃদয়জুড়ে প্রেম-আবেগ-পতিভক্তি সৃষ্টিগতভাবেই থাকে। জীবনে পদার্পণকারী প্রথম পুরুষকে সে শরীর-মন উজাড় করে ভালবাসতে চায়, হৃদয়ে স্বপ্ন-অভিমান-খুনসুটির বাগান সাজায় স্বামীকে ঘিরে। ফলে পারিবারিক মনোমালিন্য ও দাম্পত্যকলহ কম হয়। ভালোবাসার উষ্ণতা থাকে আকাশচুম্বী। ওদিকে কুমারীর চপলতা, লজ্জানম্র চাহনি, লাজুক পদচারণা, কপট রাগ, গালফোলা-অভিমান স্বামীকেও প্রবল আকর্ষণ, গভীর প্রেম ও অনাবিল মায়ার বাঁধনে বেঁধে দেয়। দুনিয়ার বুকে যেন একটুকরো বেহেশতে পরিণত হয় সংসারটি।

পক্ষান্তরে অকুমারী মেয়ের ব্যাপারটা ভিন্ন। অকুমারীরা আবেগপ্রবণ হওয়ার চেয়ে বাস্তববাদী হয় বেশি। তার প্রেমে-আবেগে প্রথম স্বামীর মতো সেই উজাড় করে দেওয়াটা আর থাকে না। দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি তার আচরণ ও ভালোবাসা থাকে পরিণত, আগের সেই কিশোরীসুলভ সরলতা-চপলতা হারিয়ে যায়। পরস্পরের মন দেওয়া-নেওয়ার চেয়ে পারস্পরিক বাহ্যিক নির্ভরতা সেখানে মুখ্য। একই কারণে, প্রথম স্বামীর মতো ভালোবাসার টানও দ্বিতীয় স্বামী অনুভব করে না। হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসার সম্পর্কটা প্রথমবারের মতো হয়ে ওঠে না। নানা বিষয়ে আগের স্বামীর সাথে তুলনা চলে আসে। সম্পর্কে তিক্ততার বহু সুযোগ তৈরি হয়। তবে ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীর প্রতিও সুবিচার, সদাচার এবং দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করার বিধান দিয়েছে। এখানে আমরা একজন কুমারের জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুমারী পাত্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছি।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী কারীম ﷺ-এর সামনে একটি উপমার দ্বারা বিষয়টির বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন – < يُؤْكَلُ لَمْ شَجَرًا وَوَجَدْتَ مِنْهَا، أُكِلَ قَدْ شَجَرَةٌ وَفِيهِ وَادِيًا نَزَلْتَ لَوْ أَرَأَيْتَ اللهِ، رَسُولَ يَا قُلْتُ غَيْرَهَا بِكْرًا يَتَزَوَّجْ لَمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ تَعْنِي «مِنْهَا يُرْتَعْ لَمْ الَّذِي فِي» :قَالَ بَعِيرَكَ؟ تُرْتِعُ كُنْتَ أَيَّهَا فِي مِنْهَا، > 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, ধরুন, আপনি একটি উপত্যকায় গিয়েছেন। সেখানে কিছু ঘাস খাওয়া আছে। আর কিছু ঘাস এখনও খাওয়া হয়নি। তাহলে আপনি আপনার উটটি কোন ঘাসগুলোতে চড়াবেন?" 'নবী কারীম ﷺ বললেন, "যে ঘাসগুলোতে এখনও উট চড়ানো হয়নি।"" অর্থাৎ আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, রাসুল ﷺ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নুআইম আসফাহানী বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আমি সেই বৃক্ষলতা (কুমারী নারী)।'

নবী কারীম ﷺ বলেছেন— < بِالْيَسِيرِ وَأَرْضَى أَرْحَامًا، وَأَنْتَقُ أَفْوَاهًا، أَعْذَبُ فَإِنَّهُنَّ بِالْأَبْكَارِ، تَزَوَّجُوا > "তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং অল্পে তুষ্ট হয়।"

তিনি আরও বলেন— < أَقْبَالاً وَأَسْخَنُ أَرْحَامًا وَأَنْتَقُ أَفْوَاهًا أَطْيَبُ فَإِنَّهُنَّ النِّسَاءِ بِشَوَابِ عَلَيْكُمْ > 'তোমরা যুবতী মেয়েদেরকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং উষ্ণযৌবনে টইটুম্বুর।'

আরেক হাদীসে নবী কারীম ﷺ বলেন— < بِالْيَسِيرِ وَأَرْضَى أَرْحَامًا، وَأَنْتَقُ أَفْوَاهًا، أَعْذَبُ فَإِنَّهُنَّ بِالْأَبْكَارِ، عَلَيْكُمْ > 'তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম, উষ্ণযৌবনের অধিকারিণী এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।'

এই বিষয়ের দিকে আলোকপাত করেই নবী কারীম ﷺ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'কুমারী স্ত্রী হৃদয়ের গহীনে অগাধ ভালোবাসার সঞ্চার ঘটায়। নিজ সতিত্ব রক্ষা করে এবং অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের শক্তি জোগায়।' বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ﷺ জাতুর-রিকা যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'জাবির, কী খবর তোমার? বিয়ে করেছ?" জাবির বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! বিয়ে করেছি।' নবীজি ﷺ জানতে চাইলেন, 'কুমারী না অকুমারী?' জাবির বললেন, 'না। অকুমারীকেই বিয়ে করেছি।' তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'কুমারী হলেই তো ভালো হতো। সে তোমার সাথে খুনসুটি করত, তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।' জাবির বললেন, 'আমার বাবা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমার সাত বোন বাড়িতে আছে। তাই আমি সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়েকেই বিয়ে করেছি। যেন সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সকলকে আগলে রাখতে পারে। এবং তাদের দেখাশোনা

করতে পারে।' নবীজি ﷺ তখন প্রশান্ত হৃদয়ে বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় তাহলে তুমি যথোপযুক্ত কাজটিই করেছ।'

কুমারীকে বিয়ে করা উত্তম নাকি অকুমারীকে

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে বিয়ে করা ভালো? কুমারীকে নাকি অকুমারীকে?' এই প্রশ্নের উত্তর আসলে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আল্লাহ তাআলা আমাদের আম্মাজান নবীপৎনীদেরকে সতর্ক করে বলেন— > عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ وَأَبْكَارًا ثَيِّبَاتٍ سَائِحَاتٍ عَابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ قَانِتَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مِنْكُنَّ خَيْرًا أَزْوَاجًا يُبْدِلَهُ أَنْ < 'যদি নবী তোমাদের সকলকেই পরিত্যাগ করেন তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারী, ইবাদাতগোজার, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।"

এই আয়াত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাগুলো এসেছে, সেগুলো একটু লক্ষ করি— হাফিয ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা হবে কুমারী ও অকুমারী।" আল্লাহ তাআলার এই কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাদের মধ্যে কেউ হবে কুমারী আর কেউ হবে অকুমারী। এটি শুধুমাত্র হৃদয়ের প্রভূত তৃপ্তির জন্য। কারণ, শ্রেণির ভিন্নতা অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কুমারী এবং অকুমারী।"'